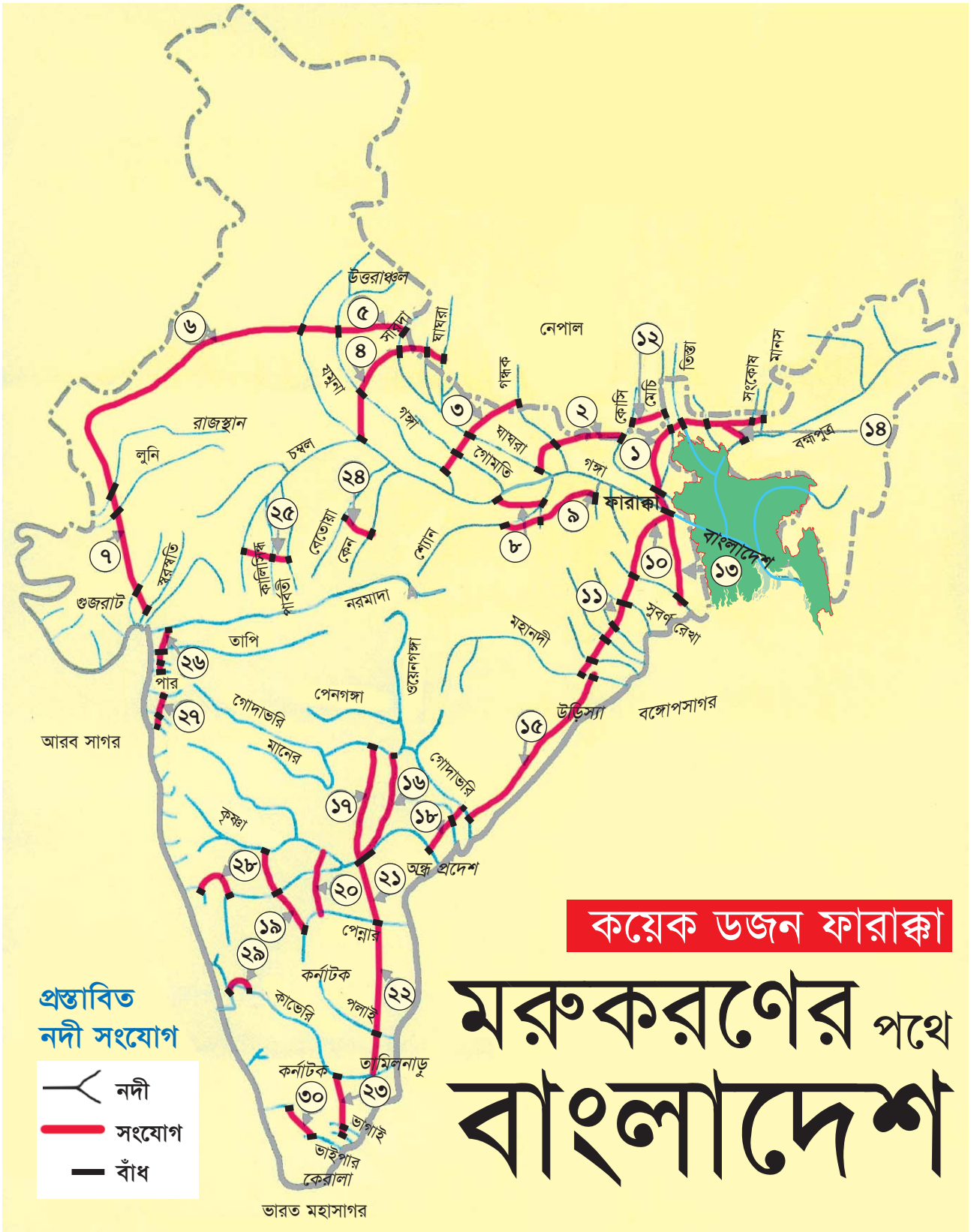


## কয়েক ডজন ফারাক্কা

# মরুকরণের পথে বাংলাদেশ

রিপোর্ট : **সাইফুল হাসান**

আগামী ২০/২৫ বছরের মধ্যে বাংলাদেশের প্রায় পুরো এলাকাই মরুভূমিতে পরিণত হতে পারে। উত্তর-দক্ষিণাঞ্চলের আবাদযোগ্য জমি থাকবে কিন্তু পানির অভাবে চাষ করা যাবে না। অনাবৃষ্টি, খরা হবে এ এলাকার মানুষের সঙ্গী। শুধু চাষের নয়, খাবার পানিরও মারাত্মক সংকট দেখা দিবে। মৎস্য খাত, নাব্য নৌপথ, সবুজ বাংলাদেশ হয়ে যাবে ইতিহাসের অংশ।

মরুময় বাংলাদেশের এমন পরিণতি মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর চেয়ে বহুগুনে ভয়াবহ হবে। সেখানকার সরকারের প্রচুর অর্থ আছে। খনিজ সম্পদ আছে। কিন্তু বাংলাদেশের কি আছে? মরুময় বাংলাদেশে মানুষের খাদ্যের সংস্থান হবে কিভাবে? কোন সম্পদ বিক্রি করে বাংলাদেশ তার জনগণের নিরাপদ খাবার পানি আর কর্মের সংস্থান করবে? হাজার হাজার গ্রামের পুরো জীবন যাত্রা কৃষির ওপর নির্ভরশীল। সেই কৃষি ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে গেলে মানুষ বাঁচবে কিভাবে? আর এ এলাকার পরিবেশের যে অপুরনীয় ক্ষতি হবে তার প্রতিকার কিভাবে করা যাবে?

এসব আশংকা এবং প্রশ্ন উঠেছে ভারত সরকারের সাম্প্রতিক একটি সিদ্ধান্তের কারনে। ভারত পরিকল্পনা নিয়েছে হাজার হাজার কিলোমিটার খাল কেটে ব্রহ্মপুত্র ও গঙ্গা সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক নদীর উজানের পানি তার দক্ষিনাঞ্চলে টেনে নেয়ার। বাংলাদেশকে মরুভূমিতে পরিণত করার মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে নিজ দেশের রুক্ষ প্রকৃতি সবুজ করার।

আন্তর্জাতিক নদীর গতিপথ নিজ দেশে ঘুরিয়ে নেয়ার কি পরিণতি নিম্ন অববাহিকার দেশটির জন্য হতে পারে তার একটি চরম উদাহরণ ফারাক্কা। বাংলাদেশের ৫৭টি নদীর মধ্যে ৫৪টি ভারতের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। এর মধ্যে প্রধান তিনটি নদী হলো গঙ্গা (পদ্মা), ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা। ভারত সরকার সম্প্রতি ব্রহ্মপুত্রের উৎস প্রধান নদী মানস ও সংকোষের ওপরও বাঁধ দেবার পরিকল্পনা করেছে। নেপাল থেকে গঙ্গার যেসব উৎস নদী আছে, তার সবগুলোর ওপর বাঁধ দিয়ে ফারাক্কার উজান থেকে গঙ্গার প্রবাহ প্রত্যাহারের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। শুকনো মৌসুমে গঙ্গার প্রায় পুরো প্রবাহই উজান থেকে প্রত্যাহার করা হবে। ফলে বাংলাদেশের ভেতরে গঙ্গার প্রবাহ আশঙ্কজনকভাবে হ্রাস পাবে। বর্তমানের গঙ্গা পানি চুক্তি তার প্রাসঙ্গিকতা হারাবে। অন্যদিকে মানস ও সংকোষ থেকে প্রবাহ প্রত্যাহার করা হলে শুকনো মৌসুমে ব্রহ্মপুত্রের প্রবাহ শতকরা ৩০-৪০ ভাগ কমে যাবে। শুধু বাঁধ নয়, ভারতের যেসব এলাকায় পানির ঘাটতি রয়েছে সেসব এলাকায় পানি সরবরাহের জন্য আন্তঃনদী সংযোগ গড়ে তোলার এক সুবিশাল পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। উচ্চাভিলাষী এই পরিকল্পনার বাস্তবায়ন হবে উদ্বৃত্ত পানি রয়েছে এমন ৩৭টি নদীর আন্তঃসংযোগের মধ্য দিয়ে। এই সংযোগের জন্য তাদের বিশাল ৩০টি সংযোগ খাল খনন করা হবে। এ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে মাত্র ২০-২৫ বছরের মধ্যে বাংলাদেশের নদীপথ, নদীভিত্তিক অর্থনীতি, প্রাণবৈচিত্র্য ও পরিবেশ ধ্বংস হয়ে যাবে।

### ভারতের স্বপ্নের প্রজেক্ট : মূল্য ১২০ বিলিয়ন ডলার

ভারত সরকার উদ্বৃত্ত পানি আছে এমন ৩৭টি নদীর আন্তঃসংযোগ সংক্রান্ত যে প্রজেক্ট হাতে নিয়েছে এটাকে বলা হচ্ছে স্বপ্নের প্রজেক্ট। ভারতের ইতিহাসে দ্বিতীয় বৃহত্তম প্রজেক্ট এটি। প্রকল্পটির বাজেট ধরা হয়েছে ৫ লাখ ৬০ হাজার কোটি রুপি বা ১২০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এই প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য সাত সদস্যবিশিষ্ট একটি টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে। টাস্কফোর্সের চেয়ারম্যান হলেন আরএসএস নেতা ও সাবেক মন্ত্রী সুরেশ প্রভু। জানা যায়, এই প্রজেক্টের অর্থ সংগ্রহ করা হবে অভ্যন্তরীণ খাত থেকে। প্রকল্পটির সময় নির্ধারণ করা হয়েছে ২০১৬ সাল। সুরেশ প্রভু ভারতীয় ওয়েবসাইট The week. comকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'প্রকল্পটিকে প্রথমে অবাস্তব মনে করা হলেও এখন বিশেষজ্ঞরা বাস্তব বলে মনে করছেন। প্রজেক্টটি সম্পন্ন হলে অতিরিক্ত ৩৫ মিলিয়ন হেক্টর জমিতে ইরিগেশন করা সম্ভব হবে। এর মাধ্যমে ৩৪ মিলিয়ন কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে। খাদ্য উৎপাদন ২২০ মিলিয়ন টন থেকে বেড়ে ৪৫০ মিলিয়ন টনে দাঁড়াবে।'

ব্রহ্মপুত্রে বাঁধ দেবার ক্ষেত্রে ভারতের যুক্তি হলো, ব্রহ্মপুত্রে পানির প্রবাহ প্রচুর এবং এই এলাকায় উদ্বৃত্ত পানি রয়েছে যা দ্বারা অন্যান্য এলাকার চাহিদা মেটানো সম্ভব। ব্রহ্মপুত্রের পানি ভারত দুই ভাগে রাষ্ট্রের দুই দিকে নিয়ে যাবে। একটি দিক হলো উড়িষ্যা, অন্ধ্র প্রদেশ, তামিলনাড়ু কর্নাটক। অন্যদিকে গঙ্গার উৎস নদীতে বাঁধ দিয়ে পাহাড়, পর্বত কেটে, কোথাও পাম্প করে উত্তর প্রদেশ, হিমাচল প্রদেশ, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, রাজস্থান ও গুজরাটে নিয়ে আসবে। অর্থাৎ শুকনো মৌসুমে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের স্বাভাবিক প্রবাহের প্রায় পুরোটাই আর বাংলাদেশে ঢুকবে না। বাংলাদেশের প্রায় পুরো জনগোষ্ঠীই এই দুই নদীর অববাহিকায় বাস করে। ভারত যদি সত্যি সত্যি ব্রহ্মপুত্রের উৎস নদীতে বাঁধ নির্মাণ করতে পারে, তবে এ এলাকার জীববৈচিত্র্য, আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট, কৃষি ও পরিবেশ ধ্বংস হয়ে যাবে। মৎস্য সম্পদ, নৌপরিবহন বলে কিছুই থাকবে না। এসব বাঁধের মানেই হলো বাংলাদেশকে নিশ্চিত বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দেয়া। দুই রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্কিত কোনো বিষয় সম্পর্কে কোনো পরিকল্পনা গ্রহণ করলে তা প্রতিবেশী রাষ্ট্রকে জানাতে হয়। এটা হলো সহজ কূটনীতি। বিভিন্ন জায়গায় খবর নিয়ে জানা গেছে, তারা এই প্রকল্প সম্পর্কে বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছুই জানায়নি। গ্লোবাল ওয়াটার পার্টনারশিপের দক্ষিণ এশিয়ার চেয়ারপারসন ও ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউটের প্রেসিডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার কামরুল ইসলাম সিদ্দিক সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'এই প্রকল্প বাবদ তারা ইতিমধ্যে ৩৬ হাজার কোটি রুপি ব্যয় করেছে।' অর্থাৎ প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। ভারত তো বাংলাদেশকে জানায়নি, পাশাপাশি বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকেও এ ব্যাপারে খোঁজ-খবর নেয়ার প্রয়োজন বোধ করেনি। বিষয়টি ও কূটনীতিভাবেও অত্যান্ত স্পর্শকাতর। ভারত বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিক-ভাবে না জানানোর অর্থ কি এই দাঁড়ায় না, তারা ইচ্ছাকৃতভাবে এই দেশকে বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দিচ্ছে?

### সরকার চুপ, দুঃস্বপ্নে বাংলাদেশ

১৯৫২ সালে ফারাক্কা বাঁধ পরিকল্পনার ওপর পত্রিকায় প্রকাশিত খবর দেখে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলো। তৎকালীন পাকিস্তান সরকার পুরো প্রজেক্ট দেখার জন্যও অপেক্ষা করেনি। কারণ ফারাক্কা হলে পাকিস্তানের পূর্ব অংশে কি বিপদ হবে তা তৎকালীন সরকার বুঝতে পেরেছিলো। ভারত সরকার গত নবেম্বরে তাদের এ পরিকল্পনার কথা প্রথম প্রকাশ

করে। এবছর মার্চে তৃতীয় বিশ্ব পানি ফোরামে এই পরিকল্পনা আন্তর্জাতিকভাবে তুলে ধরা হয়। ভারতের এই স্বাপ্নিক প্রকল্প নিয়ে বেশ কিছুদিন যাবৎ মিডিয়া ও বেসরকারি বিভিন্ন ফোরামে আলোচনা চলছে। অথচ বাংলাদেশ সরকার এখন পর্যন্ত একটা প্রতিবাদ তো দূরের কথা, কোথাও তাদের একটা বক্তব্য পর্যন্ত লক্ষ্য করা যায়নি। বাংলাদেশের মন্ত্রী, সচিব, আমলারা যখন ফারাক্কার পানি পাওয়া নিয়ে হা'হুতাশ করছে, তখন সুরেশ প্রভুর টাস্কফোর্স আন্তঃনদী সংযোগ গড়ে তোলার জন্য কোটি কোটি রুপি ব্যয় করছে। ইঞ্জিনিয়ার কামরুল ইসলাম সিদ্দিক সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'বিভিন্ন সূত্রে গত দু'বছর ধরেই আমরা ব্যাপারটি সম্পর্কে অবহিত। গ্লোবাল ওয়াটার পার্টনারশিপের এই এলাকার চেয়ারপারসন হিসেবে আমি বেসরকারি বিভিন্ন ফোরামে জানিয়েছি। ওয়ার্কশপ করেছি। কিন্তু সরকারিভাবে কোনো উদ্যোগ নেয়া হয়নি।' অন্য একজন বিশেষজ্ঞ বলেন, 'ব্রহ্মপুত্রের ওপর বাঁধ নির্মাণ হলে আমাদের কতটা বিপদ এ সম্পর্কে সম্ভবত সরকার সচেতন নয়।' এ বিষয়ে জানার জন্য যৌথ নদী কমিশনের সদস্য তৌহিদুল আনোয়ার খানের কাছে ফোন করা হয়। টেলিফোনে তিনি সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'ভারত ৩৭টি নদীর মধ্যে যে সংযোগ গড়ে তুলছে সে ব্যাপারে আমরা খোঁজ-খবর নিচ্ছি। এটা এখনও প্রজেক্ট আকারে আসেনি। প্রজেক্ট আকারে না এলে কিসের ভিত্তিতে প্রতিবাদ করবো। তারপরও এবার কিয়োটোতে বিশ্ব পানি ফোরামের সম্মেলনে এ ব্যাপারে প্রতিবাদ জানিয়েছি।' কথা বলার এক পর্যায়ে তিনি এব্যাপারে অনেক সময় দিয়েছেন বলে ফোন রেখে দেন। কি অদ্ভুত দেশ আর অদ্ভুত কর্মকর্তা! ইতিমধ্যে এই প্রকল্পে বিপুল অংকের অর্থ ব্যয় করা হয়েছে। ভারতের বহু পত্রিকায় (যেমন স্টেটসম্যান, দি হিন্দু, আজকাল) এব্যাপারে তথ্যভিত্তিক বহু প্রতিবেদন ছাপা হয়েছে। তারপরও বাংলাদেশের একজন কর্মকর্তা বলছেন প্রকল্প আকারে না এলে কিভাবে প্রতিবাদ করবো?

কথার এক পর্যায়ে তৌহিদুল আনোয়ার খান সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেছেন, 'ভারতের এমন আচরণ নতুন নয়। এর আগে তারা এমন অনেক উদ্যোগ নিয়েছে। তাই বলে সেগুলো কি বাস্তবায়ন করেছে? ২০০০ ফুট ওপর দিয়ে পানি অন্য এলাকায় নিয়ে যাওয়া কি সহজ ব্যাপার? আমরা খোঁজখবর নিচ্ছি। এটা নিয়ে অকারণে চেচাঁমেচির কোনো প্রয়োজন নেই।' প্রশ্ন হচ্ছে, প্রজেক্ট আকারে আসার পরে প্রতিবাদ করা হবে এটা কোন ধরনের যুক্তি? ততদিনে তো বাংলাদেশের অনেক কিছুই আর করার থাকবে না। তৌহিদুল আনোয়ার খানও স্বীকার করেন ভারতে যদি এই প্রজেক্ট সম্পন্ন হয় তাহলে বাংলাদেশের মরণ অবস্থা হবে। অনুসন্ধানে জানা গেছে, সরকারের উচ্চ পর্যায়েও এই সম্পর্কে খুব পরিষ্কার ধারণা নেই। এই বিষয়ে বিশ্ব পরিবেশ দিবসে পানিসম্পদ মন্ত্রী এক সেমিনারে বলেছেন, তারা এ ব্যাপারে কড়া প্রতিবাদ জানাবেন। আর পদক্ষেপ নেবেন। প্রয়োজনে এই বিষয়টিকে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ফোরামে নিয়ে যাবেন। এই সেমিনারে পরিবেশমন্ত্রী শাজাহান সিরাজও একই প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন। বিশ্ব পরিবেশ দিবস গত হয়েছে এক মাস হলো। কিন্তু এখন পর্যন্ত সরকারি প্রতিবাদের কোনো খবর পাওয়া যায়নি। এ বিষয়ে পানিসম্পদ প্রতিমন্ত্রী অ্যাডভোকেট গৌতম চক্রবর্তীর সঙ্গে কথা বলা হয়। তিনি টেলিফোনে সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'আমি আসলে অফিসিয়ালি বিষয়টা জানি না। ভারতও অফিসিয়ালি কিছু করেনি। ব্যাপারটি এখনও তাদের পরিকল্পনার পর্যায়ে রয়েছে। মিডিয়ায় এ সংক্রান্ত খবর দেখে আমরা উদ্বিগ্ন। জনমত গড়ে তুলছি। মনিটর করছি। তারা যদি এটা করে তাহলে আমাদের অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন হবে।' কিন্তু বিষয়টির তো প্রতিবাদ করা উচিত? উত্তরে তিনি বলেন, 'অফিসিয়ালি ভারত না জানালে আমরা প্রতিবাদ করতে পারছি না। যতদূর শুনেছি তারা এখনও স্টাডির পর্যায়ে আছে। আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী যৌথ নদীর ক্ষেত্রে তারা এটা করতে পারে না। এই প্ল্যান থেকে তারা সরে না এলে আমাদের দেশ মরুভূমিতে পরিণত হবে। এটা জেনেই আমরা নিয়মিত খোঁজ-খবর নিচ্ছি।'

ভারতের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হলে বাংলাদেশ ধ্বংস হয়ে যাবে। এরকম একটি প্রকল্প যখন বাস্তবায়নের পথে তখন বাংলাদেশের কূটনৈতিক ব্যর্থতাই প্রকট হয়ে ওঠে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে ভারত তার দেশের জনগণের সুবিধার কথা বিবেচনা করছে। আর জনগণের সুবিধার ব্যাপারে তারা অত্যন্ত সজাগ। অন্যদিকে আমাদের সরকার

# 'ব্রহ্মপুত্রে বাঁধ হলে পরিবেশ ও কৃষিতে ভয়াবহ বিপর্যয় নেমে আসবে'

**ইঞ্জিনিয়ার কামরুল ইসলাম সিদ্দিক**
*প্রেসিডেন্ট, আইইবি*
*চেয়ারম্যান, গ্লোবাল ওয়াটার পার্টনারশিপ, দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চল*

***সাপ্তাহিক ২০০০ : ভারতের ড্রিম প্রকল্প আন্তঃনদী সংযোগের ব্যাপারটি কখন জানতে পারেন? জানার পর কি করেছেন?***

**ইঞ্জিনিয়ার কামরুল ইসলাম সিদ্দিক :** গত দুই বছর ধরে আমরা জানি। তারপর আমরা ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ ও গ্লোবাল ওয়াটার পার্টনারশিপে আলোচনা শুরু করি। এরপর বিষয়টি সম্পর্কে সবাইকে সচেতন করার জন্য ৬টি ওয়ার্কশপ করেছি।

***২০০০ : বিষয়টি মিডিয়ায় নিয়ে এলে তো আরো অনেক বেশি মানুষ জানতে পারতো। সেটা করলেন না কেন?***

**কামরুল ইসলাম :** প্রথমে বিষয়টি আমরা বোঝার চেষ্টা করেছি। তারপর বিভিন্ন পেশাজীবীদের জানিয়েছি। সেই সঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় আমরা বিষয়টা আলোচনা করেছি। আস্তে আস্তে জনসচেতনতা বাড়ছে। তা খুবই কম।

***২০০০ : ভারত যদি ব্রহ্মপুত্রের ওপর বাঁধ নির্মাণ করে তবে আমরা মূলত কি ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন হবো?***

**কামরুল ইসলাম :** ফারাক্কা হবার ফলে কি হয়েছে? দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের পরিবেশের ওপর মারাত্মক প্রভাব পড়ছে। এ রকম ব্রহ্মপুত্রের পানি ভারত প্রত্যাহার করে নিলে এবং তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে বিরাট এলাকা পানিহীন হয়ে পড়বে। বিশেষ করে শাখা নদীগুলোতে

## প্রকল্প থেকে ভারত যা পাবে

১. বন্যা ও খরা নিয়ন্ত্রণ।
২. ১৫০ মিলিয়ন একরের বেশি জমি সেচকাজের অন্তর্ভুক্ত হবে।
৩. প্রায় ৬০ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে।
৪. পানিপথে যাতায়াতের সৃষ্টি হওয়ায় পরিবহন ব্যয় এবং জ্বালানি খরচ কমবে।
৫. খাবার পানির সমস্যা দূর হবে।
৬. চাকরির সুযোগ সৃষ্টি হবে।
৭. শিল্প ও পর্যটন শিল্পের বিকাশ ঘটবে।
৮. পানি বিদ্যুৎ ব্যবহারের ফলে বায়ু দূষণ কমে আসবে।
৯. ভূগর্ভস্থ পানি বৃদ্ধি পাবে।
১০. বনসম্পদ ও বন্যপ্রাণী বৃদ্ধি পাবে।
১১. বনায়নের ফলে গ্রীষ্মের তাপমাত্রা কমে আসবে।

পানি প্রবাহ কমে যাবে। এর ফলে বাংলাদেশের নৌপরিবহন ও মৎস্য সেক্টর ধ্বংস হয়ে যাবে। পরিবেশের জন্য যে পরিমাণ পানির দরকার তার সংকট দেখা দেবে। ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যাবে। এতে খাবার পানির উৎসগুলো অকেজো হয়ে পড়বে। গাছপালা তার শেকড়ে পানি পাবে না। এতে একটা দীর্ঘস্থায়ী মরুকরণ প্রক্রিয়া শুরু হবে। আরেকটা ব্যাপার হলো, যে পরিমাণ মিঠা পানি সাগরে পড়ে, এই প্রবাহ কমে গেলে সাগরের পানি অনেক ভেতরে চলে আসবে। সাগরে পানির লবণাক্ততা ও মিঠা পানির অভাবে পরিবেশ ও কৃষিতে ভয়াবহ বিপর্যয় নেমে আসবে।

***২০০০ : অর্থাৎ জনজীবন ভয়াবহ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে যাচ্ছে?***

**কামরুল ইসলাম :** হ্যাঁ! ঠিক তাই। কি বিপদ আমাদের সামনে অপেক্ষা করছে সবাই তা বুঝতে পারছি না। জনজীবনে যে বিরাট বিপর্যয় নেমে আসতে যাচ্ছে এ বিষয়ে এখনই সবাইকে অবহিত করা প্রয়োজন।

***২০০০ : ভারত যদি ব্রহ্মপুত্রের পানি প্রত্যাহার করা শুরু করে তবে তো কয়েক কোটি মানুষ ও প্রাণীর জীবন হুমকির সম্মুখীন হবে। এ মুহূর্তে আমাদের কি করণীয় বলে আপনি মনে করেন?***

**কামরুল ইসলাম :** দেখেন, আমি সবাইকে বোঝাতে চাচ্ছি- ভারত যা করতে চাচ্ছে তা যদি সম্পন্ন করে তবে বাংলাদেশের প্রায় অর্ধেক জনগণের জীবনে পরিবেশ ও অর্থনৈতিক বিপর্যয় নেমে আসবে। আমাদের এখই সোচ্চার হওয়া প্রয়োজন। কারণ এখনই নিশ্চিত করা দরকার তারা পানি প্রত্যাহার শুরু করলে কতটুকু পানি আমরা পাবো। গত পরিবেশ দিবসে পানিসম্পদমন্ত্রী ও পরিবেশমন্ত্রী এক সেমিনারে বলেছেন তারা এ ব্যাপারে দ্রুত পদক্ষেপ নেবেন। ইতিমধ্যেই এটা করা জরুরি ছিলো। লক্ষ্য করলে দেখবেন, সুন্দরবনের সুন্দরী গাছ মারা যাচ্ছে। কারণ কি? কারণ ওখানকার ইকোলজিক্যাল ভারসাম্য নষ্ট হবার পথে। সুন্দরবন এখন বিশ্ব ঐতিহ্য। তো ভারত এ কাজ করলে রংপুর থেকে শুরু হয়ে খুলনা পর্যন্ত এ রকম পরিবেশ ভারসাম্য হারাবে।

***২০০০ : পানি কতটুকু পাবো তার নিশ্চয়তা বিধানের কথা আপনি বলছেন। প্রশ্ন হলো, পানি এনে লাভ কি? সেটা তো সংরক্ষণ করতে পারছি না!***

**কামরুল ইসলাম :** আমিও এটাই বলছি। এখনই আমাদের ব্রহ্মপুত্র ও পদ্মার সংযোগস্থলে একটা ব্যারেজ করা দরকার। এর মধ্য দিয়ে পানি সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে। আবার দুই নদীর পানি প্রবাহকে কাজেও লাগাতে পারবো।

***২০০০ : আন্তর্জাতিক আইনানুযায়ী ভারত কি এটা করতে পারে?***

**কামরুল ইসলাম :** না। বায়োডাইভারসিটি কনভেনশনে বলা হয়েছে, জীববৈচিত্র্য নষ্ট করা যাবে না। ভারতের এই প্রকল্পের ফলে জীববৈচিত্র্য নষ্ট হবে। আন্তর্জাতিক পানি আইন বা নদী আইন অনুযায়ীও নদীর স্বাভাবিক প্রবাহকে থামিয়ে পানি প্রত্যাহার করা যাবে না। অতএব, আন্তর্জাতিক আইনানুযায়ী ভারতের এই প্রচেষ্টা ঠিক নয়।

***২০০০ : আপনার কি মনে হয় ভারতকে থামানো সম্ভব?***

**কামরুল ইসলাম :** আমরা যা দেখছি তাতে তারা এগিয়ে যাবে বলেই মনে হয়। কারণ তারা ইতিমধ্যেই এই প্রকল্পে অর্থ বিনিয়োগ শুরু করেছে। ১২০ বিলিয়ন ডলার খরচ করবে তারা। ইতিমধ্যে ৩৬ হাজার কোটি রুপি এই প্রকল্পে খরচ করে ফেলেছে। নিজস্ব সম্পদ থেকে এই অর্থ সংগ্রহ করবে। এখন এটা যদি আমরা বৈদেশিক সম্পর্ক বাণিজ্যের সঙ্গে লিঙ্ক করতে পারি, তবে আমার ধারণা ভারত বাংলাদেশকে গুরুত্ব দিতে বাধ্য হবে।

***২০০০ : গ্লোবাল ওয়াটার পার্টনারশিপের দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের চেয়ারম্যান হিসেবে আপনারা কি করছেন?***

**কামরুল ইসলাম :** বিভিন্ন ফোরামে আলোচনা করছি। সর্বশেষ কোয়েটায় অনুষ্ঠিত বিশ্ব পানি সম্মেলনে আমরা এটা নিয়ে আলোচনা, বিতর্ক করেছি। সব পেশাজীবীকে জানানোর চেষ্টা করছি। মূল কাজ তো করবে সরকার। আমরা তাদের সমর্থন দিতে পারি মাত্র। এখানে মিডিয়াও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

বা বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো এ ব্যাপারে প্রায় কিছুই জানে না বলা চলে। নদী আটকে একটি দেশকে মরুকরণের দিকে ঠেলে দেয়ার চেষ্টায় লিপ্ত ভারত আর বাংলাদেশের সরকার চুপচাপ বসে থাকবে- একটি দেশের জনগণের জন্য এর চেয়ে দুর্ভাগ্যের আর কি আছে!

## বাংলাদেশ হবে মরুভূমি পরিবেশবাদীরা কোথায়

উজানে নদীর পানি আটকে দিলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হবে জীববৈচিত্র্যের। গাছপালা ধ্বংস হয়ে যাবে। বেঁচে থাকার জন্য যে জীবনচক্র তার পুরোটাই ধ্বংস হয়ে যাবে। এই প্রকল্প নিয়ে ভারতের পরিবেশবাদী, সিভিল সোসাইটিসহ বিভিন্ন স্তরের সংগঠনগুলো প্রতিবাদ জানাচ্ছে। এই প্রকল্প তারা বন্ধের দাবি জানিয়েছে। আর বাংলাদেশের পরিবেশবাদীরা জানেই না এমন একটি ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে। ঢাকায় গাছ কাটা হলে মানববন্ধন হচ্ছে। তারা যখন গাছ কাটার প্রতিবাদ করে তখন সমাজের সর্বস্তরের মানুষ তাদের অভিনন্দন জানায়। কিন্তু দেশের সুবিশাল বৃক্ষসম্পদ যখন হুমকির সম্মুখীন প্রতিবাদকারী সেই পরিবেশবাদী সংগঠনগুলো তখন কোথায়? দেশ যখন হুমকির মুখে তখন তারা নিশ্চুপ কেন? তৃতীয় বিশ্ব পানি ফোরাম থেকে ফিরে দেশের বিশিষ্ট পানি বিশেষজ্ঞ ও প্রকৌশলী আ. ন. হ আক্তার হোসেন এ বিষয়ে প্রকাশ্যভাবে তার মতামত তুলে ধরেন। জানা যায়, তৃতীয় বিশ্ব পানি ফোরামের যে অধিবেশনে ভারতের এ পরিকল্পনা তুলে ধরা হয়, বেগম হাসনা মওদুদ ঐ অধিবেশনে দাঁড়িয়ে সর্বপ্রথম এর প্রতিবাদ জানান এবং বিশ্ব জনমতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

এই অবস্থায় দেশে সিভিল সোসাইটি ও পরিবেশবাদীরাই সবচেয়ে বেশি কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারতো। জনগণকে সচেতন করতে পারতো। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, এ বিষয়ে সবাই অসম্ভব রকম চুপচাপ। এ বিষয়ে ভারতের নর্মদা আন্দোলনের নেতা মেধা পাটকর বলেছেন, 'বিষয়টি নিয়ে এক ধরনের রাজনীতি চলছে।' রাজেন্দ্র সিং, যিনি পানি সংরক্ষণ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ এবং ম্যাগাসাসি অ্যাওয়ার্ড বিজয়ী। তিনি এই প্রকল্প সম্পর্কে বলেছেন, 'এই প্রকল্প প্রযুক্তিগতভাবে ফিজিবল নয়। কিছু নদীর মধ্যে সংযোগ গড়ে তোলা সম্ভব। কিন্তু এই প্রকল্পের মাধ্যমে পানি সমস্যার সমাধান হবে এটা কোনোভাবেই বিবেচনাপ্রসূত নয়।' কল্যাণ রুদ্র নামের অন্য একজন বিশেষজ্ঞ বলেন, 'এ প্রকল্প আইনের লঙ্ঘন। এর মধ্য দিয়ে নদীর স্বাভাবিক চরিত্র ও প্রকৃতি বৈচিত্র্য নষ্ট হবে।' ড. ভারত সিং, পানিসম্পদ উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ বলেন, 'এটা দেখতে কিছুটা বেখাপ্পা মনে হয়। কারণ বর্তমান প্রকল্পের নদীর আন্তঃসংযোগ পরিকল্পনাটি পরিকল্পনা কমিশন থেকে আসেনি, আবার জাতীয় পানিসম্পদ উন্নয়ন কাউন্সিল থেকেও আসেনি।' তিনি এই প্রকল্পের লক্ষ্য অর্জনকে কঠিন বলে অভিহিত করেছেন। ভারতের অন্য একজন প্রকৃতিবিদ বলেছেন, 'ভবিষ্যতের এই স্বপ্নময় প্রকল্প প্রকৃতিকে বড় আকারে ধ্বংস করবে। যা ভারত, বাংলাদেশ ও নেপালের অর্থনীতি এবং সামাজিক অবকাঠামোর ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলবে।' ভারতের এই পরিকল্পনার বিষয়ে প্রকৌশলী আক্তার হোসেন মনে করেন, এই প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অনেক কারিগরি সমস্যা থাকলেও ভারতের প্রযুক্তিগত বিকাশের ফলে তা অসম্ভব নয়। তিনি আরো মনে করেন, এক্ষেত্রে ভারতের রাজনৈতিক ইচ্ছাই মুখ্য। যা প্রতিফলিত হয়েছে ভারতীয় লোকসভায় প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলের সমঝোতার মধ্য দিয়ে।

ভারতে প্রতিবাদ হলেও সেখানকার সরকার চেষ্টা করছে সবাইকে সঙ্গে নিয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করতে। এই প্রকল্পের প্রতিবাদে ভারতে পরিবেশবাদীরা রাস্তায় নেমেছে। বাংলাদেশের পরিবেশবাদীরা কবে রাস্তায় নামবে? দেশ ধ্বংসের পরে?

## যেভাবে এই প্রকল্পের শুরু

১৯৮২ সালে ভারতের জাতীয় পানি উন্নয়ন সংস্থা চূড়ান্তভাবে হিমালয়ান অংশে ১৯টি ও দক্ষিণ ভারতে ১৭টি ক্যানেলের প্রস্তাব করে। অর্থাৎ ভারতের এই পরিকল্পনা অনেক আগে থেকেই ছিলো। ২০০২ সালে ভারতের রাষ্ট্রপতি এ পি জে আবুল কালাম জাতির উদ্দেশে ভাষণ দানকালে ১৯৮২ সালের পরিকল্পনার কথা পুনর্ব্যক্ত করেন। রাষ্ট্রপতির ভাষণের পর তামিলনাড়ুর একটি অ্যাকটিভিটিস্ট গ্রুপ সুপ্রিম কোর্টে মামলা ঠুকে

দেয়। উল্লেখ্য, কাবেরী নদীর পানি নিয়ে কর্নাটক ও তামিলনাড়ুর মধ্যে বিরোধ রয়েছে। এই মামলার ভিত্তিতে ভারতীয় সুপ্রিম কোর্ট একটি রায় প্রদান করে। রায়ে কোর্ট সরকারকে সব রাজ্যের মধ্যে সমান পানি বন্টনের নির্দেশ দেয়। সেই সঙ্গে সরকারকে আদালত এজন্য ১০ বছরের মধ্যে আন্তনদী সংযোগের পরামর্শ দেয়। বিজেপি সরকার এই সুযোগটাই গ্রহণ করে। এই প্রকল্পে সরকারের আগ্রহ দেখে ভারত সরকারের সাবেক পানিসম্পদ সচিব রামস্বামী আর আইয়ার বলেন, 'এটা সরকারের অস্বাভাবিক তৎপরতা ও আগ্রহ। সুপ্রিম কোর্ট সরকারকে রাজনৈতিক দিক থেকে আকর্ষণীয় একটা প্রস্তাব পেশ করেছে এবং বিজেপি সরকার দ্রুত তা গ্রহণ করেছে। এই প্রকল্প ঘোষণার পরে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে প্রস্তাবিত এই স্বপ্নময় প্রকল্প থেকে বেশি রাজনৈতিক সুবিধা নেয়া যাবে। বিরোধী দল এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কিছু বলবে না কারণ এর সঙ্গে জাতীয় স্বার্থ জড়িত।' গ্লোবাল ওয়াটার পার্টনারশিপের দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার কামরুল ইসলাম সিদ্দিক সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'ভারতীয় সুপ্রিম কোর্টের রায়ের সঙ্গে ব্রহ্মপুত্রের উৎস নদীতে বাঁধ দেয়ার কোনো সম্পর্ক নেই। সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছে মূলত কাবেরী নদীর পানি নিয়ে যে বিরোধ তার ওপর ভিত্তি করে।' কামরুল ইসলাম সিদ্দিকের মতে, বিজেপি সরকার এই প্রকল্প করতে বদ্ধপরিকর। যে কোনো মূল্যে তারা এটা করবে। বাংলাদেশ বাঁচবে কি মরবে এটা নিয়ে তাদের ভাবার সময় নেই।

### ব্যর্থতা নিজেদের : প্রয়োজন দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক

ভারতের আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পটি প্রথমে জানার কথা ভারতে বাংলাদেশী দূতাবাসের। তারা বিষয়টি ভালোভাবে জেনে সরকারকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেবে, এটাই ছিলো স্বাভাবিক। কিন্তু বাস্তবে তা ঘটেনি। এক্ষেত্রে ব্যর্থতা আমাদেরই। ভারতের মতো দৈত্যাকৃতির রাষ্ট্রের সঙ্গে ঠোকাঠুকি নয় বরং দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কোন্নয়নের মধ্য দিয়েই পারস্পরিক সমস্যাগুলোর সমাধান করতে হবে। আসন্ন বিপদটি যেহেতু কোনো দলের নয়, দেশের ও জনগণের; তাই এ বিষয়ে প্রয়োজন ছিলো রাজনৈতিক ঐকমত্যের। আজ পর্যন্ত কোনো সংসদ সদস্য সংসদে এ বিষয়ে সরকারের কাছে কোনো ব্যাখ্যা চেয়েছেন বলে শোনা যায়নি। এরকম একটা ঘটনা বাংলাদেশ ঘটালে ভারতের পার্লামেন্টে কি হতো সেটা রাজনীতিবিদরা চিন্তা করে দেখেছেন?

আজকের পৃথিবী নিজেদের সুসংহত ও নিরাপদ করার। যদি কেউ চিন্তা করে ভারত আমাদের স্বার্থ দেখবে, তাহলে বলতেই হয় তারা বোকার স্বর্গে বাস করছে। ভারত দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম অর্থনৈতিক শক্তি ও সুপার পাওয়ার। এই শক্তিকে সুসংহত করতে তাদের সবদিক থেকে স্বাবলম্বী হওয়া প্রয়োজন। সেই কাজটি তারা করছে। ব্রহ্মপুত্রের পানি তারা পাহাড়-পর্বত পেরিয়ে গুজরাট, রাজস্থানে নিতে চায়। পাশাপাশি আন্তঃনদী সংযোগের মধ্য দিয়ে নিজেরা নিরাপদ পানি ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে চায়। নিম্ন অববাহিকার দেশ হিসেবে একই রকম চিন্তা বা পানিসম্পদের সার্বিক ব্যবস্থাপনার কথা তো বাংলাদেশের বরং আরও আগে ভাবা উচিত ছিলো।

একটি সূত্র থেকে জানা গেছে, বাংলাদেশে আগামী মাসে একটি পানি ব্যবস্থাপনা নীতি পাস হতে যাচ্ছে। ফারাক্কার প্রভাবে দক্ষিণাঞ্চল শুকিয়ে গেছে। বাংলাদেশের কোনো নদীরই পানি ধারণ ক্ষমতা নেই। গত ৩০ বছরে বাংলাদেশের কোনো সরকারই নিরাপদ নদী ব্যবস্থাপনা ও পানি সংরক্ষণের কথা ভাবেনি। এমনকি ঠিকমতো নদীর নাব্যতা ধরে রাখার উদ্যোগও নেয়া হয়নি। বর্তমান সরকারেরও এ বিষয়ে কোনো ভাবনা আছে বলে মনে হয় না। হাসিনা সরকার ফারাক্কা চুক্তি করেছে। চুক্তির ভিত্তিতে বাংলাদেশ যে পানি পাচ্ছে, তা আমরা কতটুকু কাজে লাগাতে পারছি? পানি আসছে আর বঙ্গোপসাগরে গড়িয়ে পড়ছে। ইঞ্জিনিয়ার কামরুল ইসলাম সিদ্দিকও পানি সংরক্ষণের ব্যাপারে জোর দিলেন। তিনি সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'ভারত এই প্রকল্প নিয়ে যেভাবে আগাচ্ছে, তাতে মনে হয় না তাদের থামানো যাবে। ব্রহ্মপুত্র আর পদ্মার পানি বাংলাদেশে না এলে আমাদের যে কি বিপদ হবে সেটা তো বলে বোঝানো যাবে না। শুধু ব্যাপারটিকে এভাবে প্রকাশ করা যায়, জীবনের অস্তিত্ব হুমকির মুখে পড়বে। আমাদের উচিত এখনই শুকনো মৌসুমের জন্য পানি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা। এর কোনো বিকল্প নেই। ভারত উজানের দেশ হিসেবে তার দেশের পানির প্রয়োজন মেটাতে নদীগুলো থেকে পানি পরিবহন করবেই। সেক্ষেত্রে আমরা কি বসে থাকবো?'

ইঞ্জিনিয়ার কামরুল ইসলাম সিদ্দিক সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'আমাদের উচিত আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, বাণিজ্যসহ সবকিছুর সঙ্গে এই ব্যাপারটি লিঙ্ক করা। সেই সঙ্গে জনসচেতনতা গড়ে তোলা। আমরা যদি বৈদেশিক সম্পর্কের সঙ্গে লিঙ্ক করে সব ফোরামে ব্যাপারটি নিয়ে যেতে পারি তবে ভারত আমাদের গুরুত্ব দিতে বাধ্য হবে। কিন্তু সবকিছুর আগে প্রয়োজন পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়ন ও সরকারি উদ্যোগ।'

# ভারতের স্বপ্নের প্রকল্প

**প্রস্তাব**

উদ্বৃত্ত পানি আছে এমন ৩৭টি নদীর মধ্যে আন্তঃসংযোগ গড়া হবে। ৯৬০০ কি.মি. দীর্ঘ ৩০টি ক্যানেলের মাধ্যমে নদীগুলোর মধ্যে সংযোগ রক্ষা করা হবে। উদ্বৃত্ত পানি পরিবহন করে যেসব এলাকায় পানি সংকট আছে সেখানে নেয়া হবে। ৩২টি বাঁধের দ্বারা ৫৬ মিলিয়ন টন সিমেন্ট ও দুই মিলিয়ন টন স্টিল খরচ হবে এই সংযোগ রক্ষা করতে।

**হিমালয়ান সংযোগ**

সংযোগ - ১৪টি
বড় বাঁধ - ৯টি
খালের দৈর্ঘ্য - ৬০৯৯ কি.মি.
পানি স্থানান্তর হবে - ৩২,৯৮৩ মিলিয়ন কিউবিক মিটার।
খরচ - ১,৮৪,৯২৯ কোটি রুপি।

**উদ্দেশ্য**

১৭৩ বিলিয়ন কিউবিক মিটার বা ব্রহ্মপুত্রের এক চতুর্থাংশ পানি ১২,৫০০ কি.মি. জালের ন্যায় বিস্তৃত খালের মাধ্যমে ৩৪ মিলিয়ন হেক্টর জমি সেচ কার্যের আওতায় আনা হবে। ১০১টি জেলা ও ৫টি মেট্রোপলিটন শহরের পানি চাহিদা মেটানো।

সব জায়গায় ঠিকমতো বৃষ্টি না হওয়া অথবা চূড়ান্ত মাত্রায় পানি ব্যবহারের ফলে সমগ্র বৃষ্টিপাতের অধিকাংশ পানি নষ্ট হয়ে যায়। আবার অনেক জায়গায় সারা বছর পানি দরকার হয়। যে সমস্ত জায়গায় বৃষ্টিপাতের মাত্র ১০০ দিন। এই প্রকল্প রাজ্যগুলোর মধ্যে পানির বৈষম্য দূর করবে। এই প্রকল্প থেকে ৩৪০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যাবে, যা ভারতে বিদ্যুতের ঘাটতি চাহিদা মেটাবে।

**প্রকল্প ব্যয়**

প্রায় ৫,৬০,০০০ কোটি রুপি বা ১২০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা ভারত সরকারের বার্ষিক রাজস্বের দ্বিগুণ এবং গত ৫২ বছরে সেচ কাজে ব্যবহৃত বাজেটের ১০ গুণ। আগামী ১০ বছরে ভারতের বর্তমান জিডিপির ২% করে ব্যয় হবে এই প্রকল্পে।

** প্রকল্পের মোট ব্যয়ের সঙ্গে ২,৬৯,৩২৬ কোটি রুপি পানি বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যয় হবে।*

**দক্ষিণ সংযোগ**

সংযোগ - ১৬টি
বড় বাঁধ - ২৭টি
খালের দৈর্ঘ্য - ৪৭৭৭ কিলোমিটার (৯৪ কিলোমিটার টানেলসহ)
পানি স্থানান্তরিত - ১,৪১,২৮৮ মিলিয়ন কিউবিক মিটার
খরচ - ১,০৫,৭৪৫ কোটি রুপি

**যেভাবে এই বিপদ মোকাবেলা সম্ভব**

ভারতকে যদি কোনোভাবেই এই প্রকল্প থেকে নিবৃত্ত করা না যায় তবে কি হবে বাংলাদেশের? বাংলাদেশ কিভাবেই বা মোকাবেলা করবে এই বিপদ? বিভিন্ন বিশেষজ্ঞের সঙ্গে সাপ্তাহিক ২০০০-এর পক্ষ থেকে যোগাযোগ করা হয়। সব বিশেষজ্ঞই প্রথমে নিরাপদ নদী ব্যবস্থাপনা ও পানি সংরক্ষণের ওপর গুরুত্ব দেন। প্রশ্ন হলো, বাংলাদেশের নদীগুলোর যা অবস্থা তা পানি সংরক্ষণ কিভাবে সম্ভব? প্রতিবছর নদীর ড্রেজিংয়ের জন্য বিশাল অঙ্কের বরাদ্দ থাকে। কিন্তু ড্রেজিংয়ের ফলে কোনো নদীর বা চ্যানেলের গভীরতা সম্পর্কে খবর পাওয়া যায় না। নদীর ড্রেজিং নিয়েও কোনো সুষ্ঠু পরিকল্পনা আছে বলে মনে হয় না। বরং নদী ড্রেজিংয়ের নামে দুর্নীতির খবরই প্রাধান্য পায়। নদী ব্যবস্থাপনা তো দূরের কথা, পানি নিয়ে সরকারের সুষ্ঠু কোনো পরিকল্পনা আছে বলেও মনে হয় না। কামরুল ইসলাম সিদ্দিকি সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'আমাদের এই মুহূর্তে একটি ব্যারেজ নির্মাণ করা দরকার। জায়গাটা হবে আরিচার কাছাকাছি। মাওয়া সেতু করছে ভালো কথা। কিন্তু আরিচার কাছে ব্যারেজ করতে পারলে পানি সংরক্ষণ সম্ভব হবে। কারণ পদ্মার মাথায় ব্যারেজ করে পানি পাওয়া যাবে না। আরিচার কাছে ব্যারেজ করলে তার সুবিধা অনেক।' তিনি বলেন, 'ব্যারেজটিকে ব্রিজ হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। এতে রাজবাড়ী অর্থাৎ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল ও ঢাকার মধ্যে চমৎকার যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে উঠবে। সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো ভারত নদীগুলো আটকে দিলেও বর্ষ মৌসুমের সংরক্ষিত পানি দিয়ে আমাদের নৌপথ, কৃষি ও পরিবেশের অবস্থা ঠিক রাখতে পারবো। ব্যারেজের এখান থেকে ৬০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব। কর্ণফুলী থেকে আমরা মাত্র ২৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পাই। চাইলে গোয়ালন্দ থেকে রেললাইনকে টেনে মানিকগঞ্জ-ঢাকা পর্যন্ত সংযোগ গড়ে তোলা সম্ভব হবে। অর্থাৎ একটা ব্যারেজের মাধ্যমে আমরা নিজেদের নিরাপদ পানি সংরক্ষণ যেমন করতে পারবো তেমনি যোগাযোগ, বিদ্যুৎসহ পরিবেশও ঠিক রাখতে পারবো।'

সাপ্তাহিক ২০০০-এর অনুসন্ধানে জানা যায়, বছর তিনেক আগে ব্রিটিশ কোম্পানি Hal Crow and Partners আরিচার কাছাকাছি একটি সমীক্ষা চালায়। এই সমীক্ষায় এ এলাকায় ব্যারেজ করতে কত খরচ হবে, কি উপকার বাংলাদেশ পাবে সে সম্পর্কে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়। এই সমীক্ষা অনুযায়ী ব্যারেজটি নির্মাণ করতে দেড় বিলিয়ন ডলারের প্রয়োজন হবে। নির্মাণ করতে সময় লাগবে ৫ বছর। স্বাভাবিকভাবেই এতো টাকা বাংলাদেশের নেই। কিন্তু প্রশ্ন হলো, তাই বলে কি বিশাল জনগণের জীবনকে ঝুঁকির দিকে ঠেলে দিতে হবে? কামরুল ইসলাম সিদ্দিক বলেন, 'দেড় বিলিয়ন ডলার টাকার অঙ্কে অনেক সন্দেহ নেই। কিন্তু যমুনা সেতুর মতো পরিকল্পনা নিয়ে এটা করা সম্ভব। একটা সরকারের জন্য কোনো কিছুই অসম্ভব নয়। চিন্তা করুন ভারত যা করছে তার প্রভাবে বাংলাদেশের যে ক্ষতি হবে তা কি টাকার অঙ্কে নির্ধারণ করা সম্ভব? দেড় বিলিয়ন ডলার উঠে আসতে কতদিন সময় লাগবে ?' খুব বেশি দিন লাগবে না। প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা কি নিজেদের জীবনকে ঝুঁকির মুখে ঠেলে দেবো, না টাকা নেই বলে বসে থাকবো?'

*সুরেশ প্রভু, আন্তনদী সংযোগ সংক্রান্ত টাস্কফোর্সের চেয়ারম্যান। তার এই প্রকল্প বাস্তবায়ন হলে বাংলাদেশের এই নদীপথ, সবুজ গ্রাম একসময় মরুকরণের পরিণতি বরণ করবে। পরিবেশবাদীরা কি তা জানেন?*

**রাজনৈতিক দলগুলো জানে না কিছুই**

আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্পে ভারতের সব রাজনৈতিক দলগুলো এক কাতারে। বাজপেয়ি, সোনিয়া গান্ধী কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করছেন। কারণ দেশের স্বার্থ। আর নিজেদের দেশ ২০-২৫ বছরের মধ্যে মরুকরণের দিকে যাচ্ছে, এ বিষয়ে আমাদের রাজনীতিবিদরা জানেনই না। কি অদ্ভুত! প্রশ্ন হচ্ছে, এসব রাজনীতিবিদের হাতে দেশ ও জনগণ কতটা নিরাপদ? এ বিষয়ে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল জলিলের কাছে প্রশ্ন করা হয়েছিল। আপনি কি জানেন, ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের কাছাকাছি ব্রহ্মপুত্র ও গঙ্গার উৎস নদীতে বাঁধ নির্মাণ করছে? এতে বাংলাদেশে মরুকরণ ঘটতে পারে? উত্তরে আব্দুল জলিল টেলিফোনে সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'আমাদের নলেজে নেই এই বিষয়টি। এরকম কিছু ঘটলে সরকারের উচিত এখনই প্রতিবাদ করা। ব্যাপারটি মিডিয়ায় আসুক, আমরা ভালো করে বুঝি তারপর এ ব্যাপারে কথা বলবো। তবে একটা ব্যাপার হলো, জাতীয় স্বার্থ রক্ষায় আওয়ামী লীগ সবসময়ই বদ্ধপরিকর।' একই প্রশ্ন করা হয়েছিল কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক মুজাহিদুল ইসলাম সেলিমকে? উত্তরে তিনি বলেছেন, 'আপনি গোয়েন্দা নাকি? আপনার প্রশ্ন কি?' প্রতিউত্তরে জানানো হয় ব্রহ্মপুত্র ও গঙ্গার উৎস নদীতে বাঁধ দেবার বিষয়টি জানেন কিনা? উত্তরে তিনি বলেন, 'আমি অত ডিটেইলস জানি না। তবে ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে যেসব চুক্তি আছে, তা যথেষ্ট নয়। আরো আলাপ-আলোচনা দরকার। এগুলো নিয়ে নানা সময় নানা কথা ওঠে। তার মানে এই নয় যে, তারা সব করে ফেলে। ভারত যদি এমন কিছু করতে চায় তবে বুঝতে হবে এটা কোনো বিচ্ছিন্ন বিষয় না, সবকিছু সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করতে হবে।' বিএনপির স্থায়ী কমিটির অন্যতম সদস্য কেএম ওবায়দুর রহমান সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'ব্রহ্মপুত্রের উৎস নদীতে বাঁধ দেয়া হচ্ছে কিনা জানি না। তবে ভারত তাদের দেশের মধ্যে কয়েকটি নদীতে বাঁধ দিচ্ছে বলে শুনেছি। এটা হলে বাংলাদেশের ভয়াবহ ক্ষতি হবে। মারাত্মক পানি সংকট দেখা দেবে। বিষয়টি নিয়ে ভারতের সঙ্গে আমাদের সরকারের বসা উচিত। তা না হলে আমাদেরও পাল্টা ব্যবস্থা নেয়া দরকার।' বিষয়টি নিয়ে বিএনপিতে বা নীতিনির্ধারক পর্যায়ে আলোচনা হয়েছে কি? উত্তরে তিনি বলেন, 'বিষয়টি নিয়ে নীতিনির্ধারক পর্যায়ে আলোচনা হয়নি। সরকারেও আলোচনা হয়েছে বলে আমি শুনিনি।' দেশের শীর্ষস্থানীয় প্রায় সকল দৈনিকেই রিপোর্ট ছাপা হয়েছে, তারপরও রাজনীতিবিদরা জানেন না। কি অদ্ভুত। কি খবর তারা রাখেন? এরকম একটা মহাযজ্ঞ পাশের রাষ্ট্রে ঘটতে যাচ্ছে সে সম্পর্কে কোনো খবরই রাখে না রাজনীতিবিদরা। তাদের কাছে কি আশা করা যায়?

**বন্ধ করো এই মহাযজ্ঞ**

ফারাক্কার মতো কয়েক ডজন ফারাক্কা। নদীর পানির স্বাভাবিক প্রবাহই শুধু নয়, বর্ষাকালের বন্যার পানিও তারা পরিবহন করে বিভিন্ন প্রদেশে নিয়ে যাবে। বন্যা বাংলাদেশের জন্য ক্ষতি করে যতটুকু উপকার করে তারচেয়ে

আরও অনেক বেশি। বাংলাদেশের মতো দেশে যদি বন্যা না হয় তবে ফসল ফলবে কিভাবে? মিঠা পানির প্রবাহ ভারত বন্ধ করে দিলে দেশের পানিতে লবণাক্ততা বেড়ে যাবে। ইতিমধ্যেই খুলনার ফুলতলা পর্যন্ত পানিতে লবণাক্ততার পরিমাণ মারাত্মক হারে বাড়ছে। সরকার এ ঘটনায় চুপচাপ থাকলে জনসাধারণের উচিত বিষয়টি নিয়ে সোচ্চার হওয়া। প্রশ্নটি শুধু পরিবেশ বিপর্যয় আর নেভিগেশনের নয়, এর সঙ্গে প্রায় সাড়ে ৫ কোটি মানুষের জীবন সরাসরি জড়িত।

ভারত বন্ধুপ্রতিম রাষ্ট্র। বাংলাদেশের জন্মের পর থেকে এই দুটি রাষ্ট্র অনেক ইস্যুতে একসঙ্গে কাজ করে আসছে। উজানের কোনো নদীর গতিপথ আটকে দেয়া আন্তর্জাতিক সব কনভেশন বা আইনের লঙ্ঘন। বাংলাদেশ এবং ভারতের মধ্যে সম্পর্ক ছোট বা বড় রাষ্ট্রের নয়। স্বাধীনতার সময় থেকে পাশাপাশি এই দুই রাষ্ট্রের যা অর্জন তার শেকড় অনেক গভীরে বলেই এ দেশের মানুষ মনে করে। বন্ধুপ্রতিম রাষ্ট্রকে মরুকরণের দিকে ঠেলে দেয়া অনেকটা বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকিস্বরূপ। নদী বা সমুদ্র কারো ব্যক্তিগত সম্পদ নয়। প্রকৃতির সব জিনিসের ওপর প্রতিটি রাষ্ট্রের নাগরিকদের অধিকার সমান। অধিকারের অর্থ এই নয় অপরকে ধ্বংস করে নিজে টিকে থাকা। কারণ এই দুটি নদীর সঙ্গে ভারতের যেমন সম্পর্ক আছে, তেমনি বাংলাদেশ ও নেপালেরও সমান গুরুত্ব রয়েছে। নদীর উৎস থেকে শেষ পর্যন্ত বিশাল জনগোষ্ঠী বাস করে। তাদের জীবনাচরণ, সংস্কৃতি ও বেঁচে থাকার উপাদান এই নদী দুটির সঙ্গে জড়িত। খাদ্য ও নিরাপদ পানি, কৃষি ও প্রকৃতি এবং আমাদের জীববৈচিত্র্য নদী দুটির ওপর নির্ভরশীল। ভারত এ ক্ষেত্রে যে আচরণ করছে সেটা বন্ধুর নয়, প্রভুর আচরণ। এই প্রকল্প হাতে নেবার আগেই তাদের উচিত ছিলো বাংলাদেশকে জানানোর। আদালতের দোহাই দিয়ে বিজেপি সরকার নিরাপদ পানি ব্যবস্থাপনার যে প্রকল্প হাতে নিয়েছে তা মূলত রাজনৈতিক কারণেই। বাংলাদেশ কেন তার শিকার হতে যাবে! সুরেশ প্রভুর এই স্বাপ্নিক প্রকল্প হয়তো গুজরাট, কর্নাটকে পানি পরিবহন করে নিয়ে যেতে পারবে। কিন্তু এর প্রভাবে ভ্রাতৃপ্রতিম রাষ্ট্রের ক্ষতির পরিমাণ কি তিনি ভেবে দেখেছেন?

শুধু ভারতকে দোষারোপ করলেই চলবে না। এখানে সরকারকে জরুরি ভিত্তিতে পদক্ষেপ নিতে হবে। জরুরি ভিত্তিতে পানি সংরক্ষণ ও নিরাপদ নদী ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে হবে। অন্যদিকে ভারতকে বুঝিয়ে শুনিয়ে এখান থেকে সরিয়ে আনতে হবে। অথবা আন্তর্জাতিক ফোরামে বিষয়টি তুলে পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

এ'সব করার উদ্যোগ নিতে হবে এখনি। ভারত কখন কি জানাবে তার জন্য অপেক্ষা তা করে আমাদের প্রো-এ্যকটিভ হওয়ার সময় এসেছে। না হলে বিশাল এক বিপর্যয়ের মুখে পড়বে আমাদের ভবিষ্যত। আমাদের অর্থনীতি ও পরিবেশ।

ছবি : **খালেদ সরকার**

**ড: আসিফ নজরুল** আন্তর্জাতিক নদী আইনের উপর পিএইচডি করেছেন ইউনিভার্সিটি অব লন্ডন থেকে। পরিবেশ ব্যবস্থাপনার উপর উচ্চতর গবেষনা করেছেন জার্মানীস্থ এনভায়রনমেন্টাল ল' সেন্টার থেকে। গবেষনাপত্র পাঠ করেছেন দেশে-বিদেশে আন্তর্জাতিক নদী আইন বিষয়ক বিভিন্ন সম্মেলনে। বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ও পরিবেশ আইন বিষয়ক আন্তর্জাতিক সংগঠন কমিশন অন এনভায়রনমেন্টাল ল'- এর সদস্য। ভারতের সাম্প্রতিক নদী পরিকল্পনার আইনগত দিক দিয়ে তার সঙ্গে কথা হয় ৭ জুলাইতে।

# 'ভারত জানে কিছু করার ক্ষমতা নেই আমাদের, আছে শুধু আবেগ'

***সাপ্তাহিক ২০০০ : যৌথ বা আন্তর্জাতিক নদীর ক্ষেত্রে নদীর পানি উভয় দেশের জন্য সমতাভিত্তিক বন্টনের নীতি আন্তর্জাতিক আইন দ্বারা কিভাবে রক্ষা করা যায়?***

**আসিফ নজরুল :** প্রধানত নদীর অববাহিকার দেশগুলোর মধ্যে চুক্তির মাধ্যমে পানিবন্টনের নীতি কার্যকর করা হয়। ১৯৯৬ সালে গঙ্গা নদী বিষয়ে একটি নিম্নস্তরের চুক্তি আমরা ভারতের সঙ্গে করেছি। এই চুক্তি ফারাক্কা পয়েন্ট-এ গঙ্গার অবশিষ্ট প্রবাহে (অর্থাৎ উত্তর প্রদেশ ও বিহারে পানি প্রত্যাহারের পর) আমাদের অংশ কতোটুকু হবে তা বলেছে। এখন ফারাক্কার উপরের অংশে ভারত ইচ্ছেমতো পানি প্রত্যাহার করে নিলে এই চুক্তি অনুসারে বাংলাদেশের তেমন কিছু করার নেই। নদী বিষয়ক আন্তর্জাতিক প্রথাগত আইন ও পরিবেশ বিষয়ক আইনের আশ্রয় অবশ্য বাংলাদেশের জন্য রয়েছে।

***সাপ্তাহিক ২০০০ : উজানের দেশ হিসেবে ভারতের আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প কি আন্তর্জাতিক আইন বৈধতা দেয়?***

**আসিফ নজরুল :** প্রশ্নই আসে না। আন্তর্জাতিক প্রথাগত আইনগুলো যেভাবে জাতিসংঘের ১৯৯৭ সালের ওয়াটারকোর্স কনভেনশনে প্রতিফলিত হয়েছে তাতে এটি স্পষ্ট যে কো-রিপেরিয়ান দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে না জানিয়ে ভারত আন্তর্জাতিক নদীর ওপর এধরনের কোন প্রকল্প নিতে পারে না। ভারতকে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে এই প্রকল্পে বাংলাদেশের অর্থনীতি ও পরিবেশের কোন বড় ধরনের ক্ষতি হবেনা।

তবে মনে রাখতে হবে, বাস্তবায়নের দিকটি বিবেচনা করলে আন্তর্জাতিক নদী আইন আন্তর্জাতিক আইনের দুর্বলতর অংশগুলোর একটি। এ'সুযোগটি যৌথ নদীর অংশীদার ক্ষমতাশালী দেশগুলো সবসময় নিয়ে থাকে। আমেরিকা একসময় নিয়েছে, চীন, তুরস্ক, মিশর এখনও নিচ্ছে। তবে ভারতের মতো এতো প্রকটভাবে কিনা তা নিয়ে সন্দেহ আছে। ভারতের এসব কার্যক্রম নিয়ে নেপাল ও ভূটানের মানুষেরও প্রচুর অসন্তোষ রয়েছে।

***সাপ্তাহিক ২০০০ : নদী জীববৈচিত্র্য, পরিবেশ ও মানুষের জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত। নদীর গতিপথ পরিবর্তনের অর্থ হলো নদীর প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের বিরোধী। সুতরাং প্রাণবৈচিত্র্য ও পরিবেশ সংরক্ষণে আন্তর্জাতিক আইন কি নিরাপত্তা দেয়?***

**আসিফ নজরুল :** ১৯৯২ সালের বায়োডাইভার্সিটি কনভেনশনে অন্যদেশের পরিবেশ ও প্রানবৈচিত্র্যের ক্ষতি না করা সম্পর্কিত বিধান রয়েছে। ১৯৭১ সালের ওয়েটল্যান্ড কনভেনশন, ১৯৭২ সালের ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ কনভেনশন সহ আরো অনেক পরিবেশ আইনে আমরা নদীর গতিপথ পরিবর্তনের কারণে সুন্দরবনের মতো এলাকাগুলোর হেরিটেজ, প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ও জীববৈচিত্র বিনষ্ট করার জন্য ভারতকে দায়ী করতে পারি। এসব বিষয় পরিবেশ বিষয়ক আন্তর্জাতিক ফোরামে ঠিকমতো তুলতে পারলে ভারতকে বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে হবে। ভারত জানে, এটি করার ক্ষমতা, প্রস্তুতি, প্রয়োজনীয় তথ্য ও পরিসংখ্যান নেই আমাদের। আছে শুধু আবেগ, সেটিও রাজনৈতিক কারণে বহুভাবে খন্ডিত।

***সাপ্তাহিক ২০০০ : বাংলাদেশের এক্ষেত্রে কি করা উচিত। সরকার বলছে ভারত আনুষ্ঠানিকভাবে না জানালে তারা প্রতিবাদ করতে পারছে না।***

**আসিফ নজরুল :** সরকারকেই ভারতের কাছে এই প্রজেক্ট-এর বিষয়ে জানতে চাইতে হবে। ফারাক্কার সময়ে তৎকালিন পাকিস্তান সরকার তাই করেছিল। ভারত বাংলাদেশকে তা জানানোর পর ১৯৯৬ সালের গঙ্গা চুক্তির প্রস্তাবনা, আন্তর্জাতিক প্রথাগত আইন, সর্বোপরি ভারতের সঙ্গে আমাদের ঐতিহাসিক বন্ধুত্বপূর্ন সম্পর্কের নীতির আলোকে ভারতের এধরনের প্রকল্পের যৌক্তিক বিরোধিতা করতে হবে। বাংলাদেশের পরিবেশবাদী সংগঠনগুলোকে এবিষয়ে আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্কিং করতে হবে, সর্বাত্নকভাবে সোচ্চার হতে হবে। মনে রাখতে হবে সরকারের যে সীমাবদ্ধতা আছে, তা সিভিল সোসাইটির নেই।